KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 8/3 Award Issue 9/2 9/4	Year of Publication : Aug 1985 Oct 1985 May 1986 Aug 1986
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
* কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার অনুষ্ঠান

পঞ্চম বর্ষ

বিভাব

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার সংখ্যা

পঞ্চম বর্ষ

৭ অক্টোবর : ১৯৮৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কাজের মানুষ ডি কে

সত্যজিৎ রায়

১৯৪৩-এর গোড়ার দিক। কলকাতা শহরে তখন জাপানী বোমার হিড়িক। মাস দুয়েক হ'লো শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে চাকরির চিন্তা করছি। কলাভবনের তালিম সত্ত্বেও ফাইন আর্ট্‌স-এর দিকে মন ঝোঁকেনি। ইচ্ছা আছে বিজ্ঞাপন-শিল্পী হবার, কিন্তু বিজ্ঞাপনের লাইনে কারুর সঙ্গে পরিচয় নেই। কী ভাবে এগোনো যায় সেটাই প্রশ্ন।

আমাদের বাড়ি তখন প্রায়ই আসতেন 'ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড' বৃদ্ধ ললিত মিত্তির। তিনি আমার সমস্যার কথা শুনে বললেন, 'কোনো চিন্তা নাই। কীমার কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার হইল আমাগো দিলীপ গুপ্ত। তারে আমি খুব চিনি। তোমারে তার কাছে লইয়া যামু।'

কীমার কোম্পানির নাম শুনিনি, তবে দিলীপ গুপ্তকে না চিনলেও তাঁর ভাই এবং বোনের সঙ্গে পরিচয় অনেক দিনের। ললিতবাবুর প্ররোচনায় তাঁর সঙ্গে রামময় রোডে দিলীপ গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। সিঁড়ির পাশে খাঁচাবন্ধ বিশাল অ্যালসেশিয়ান; তাকে পাশ কাটিয়ে দোতলায় উঠে প্যাসেজের শেষ প্রান্তে ডান দিকের বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই চটির ভারী শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে গুপ্তমশাই প্রবেশ করলেন। পরনে হাফশার্ট ও পায়জামা, চোখে পাওয়ার সম্বলিত টিনটেড চশমা, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন দশাসই চেহারা। চেহারা দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই।

আমার আসার কারণ তাঁকে জানালাম। ভদ্রলোক মিনিট দশেক নানান প্রশ্ন ক'রে আমাকে বাজিয়ে দেখার পর বললেন, 'একটা কাল্পনিক প্রডাক্ট নিয়ে ছবি ও ক্যাপশন সমেত গোটা চারেক বিজ্ঞাপনের খসড়া ক'রে অমুক দিন অমুক সময়ে পাঁচ নম্বর কাউনসিল হাউস স্ট্রীটে আমাদের আপিসে চ'লে এসো; ক্রম সাহেবের সঙ্গে তোমার মোলাকাত করিয়ে দেব।' সেইসঙ্গে একটা সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করলেন এই মর্মে যে চাকরি যদিও বা পাই—'দ্য স্যালারি উইল ব্রেক ইওর হার্ট'।

সেই বৈঠকেই কথা প্রসঙ্গে আমার পারিবারিক পরিচয় পেয়ে দিলীপ গুপ্ত জিগ্যেস করলেন, 'আবোল তাবোল হযবরল-র কী অবস্থা?' জানালাম

সেগুলো এখনও ছাপা হয় এবং বিক্রি হয়, তবে প্রকাশক আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। 'পয়সা দেয়?' প্রশ্ন করলেন দিলীপ গুপ্ত। জানাতে হ'লো আজ পর্যন্ত ওই দুখানা এবং উপেন্দ্রকিশোরের কোনো বই থেকে কোনো অর্থাগম হয়নি। দিলীপবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন বটে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না।

কীমার কোম্পানিতে জুনিয়র ভিজুয়্যালাইজারের চাকরিতে যোগ দিই এর দুমাস পরে। তখন থেকেই দিলীপ গুপ্ত ওরফে ডি. কে-র সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয়ের সূত্রপাত। বিজ্ঞাপনের জগতে কীমারের তখন বেশ নামডাক এবং তাঁর অনেকটাই নাকি ডি. কে.-র দৌলতে। চলনে বলনে ভারভাতিক এই যুবকটি অল্প কালের মধ্যেই পাবলিসিটির চাবিকাঠিটি আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন। বিজ্ঞাপনে কী কী উপাদন থাকলে লোকের চোখ ও মন টানবে, কোন্ প্রডাক্টের পক্ষে কোন্ স্লোগান হবে সবচেয়ে লাগসই, লোগোটাইপের ধাঁচ কেমন হওয়া উচিত, খবরের কাগজের কোন্ পৃষ্ঠার কোন্ জায়গায় বিজ্ঞাপন দিলে সেটা মাঠে মারা যাবে না, এ-সবই তাঁর নখদর্পণে। সেইসঙ্গে মুদ্রণ-শিল্পের যাবতীয় কলাকৌশল সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই কাজে এঁর যে অসীম উদ্দীপনা, সেটা তিনি কর্মীদের মধ্যে সঞ্চার করতে সক্ষম, যার ফলে চা-বিস্কুট-জিন্-সিগারেট-মোটরের টায়ার ইত্যাদির ক্যাম্পেন তাদের কাছে হ'য়ে ওঠে এক-একটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড।

আমি কীমারে কাজে যোগ দেবার বছরখানেকের মধ্যেই ডি. কে. সিগনেট প্রেসের পত্তন করেন। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার ও অবনীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্য নিয়েই কাজ শুরু। প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং প্রয়োজনে ইলাস্ট্রেশনের ভার দিলেন আমাকে। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের বই ছাপাবার আগে কাগজে নোটিশ দিলেন যে বইগুলি পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে। যাঁরা এতদিন সেগুলি প্রকাশ করছিলেন তাঁরা এই নোটিশ অগ্রাহ্য করলেন। ফলে বেশ-কিছুদিন ধ'রে এই বইগুলির দুরকম সংস্করণ বাজারে চালু রইলো।

বাংলা বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠবে সিগনেট যে সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মূলে ছিলো ডি. কে.-র গভীর জ্ঞান, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একরোখা পারফেকশনিজ্‌ম। সিগনেটের আগে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয় বিশ্বভারতীর অনাড়ম্বর গ্রন্থসজ্জায় সুরুচি ও

আভিজাত্যের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ডি. কে. একটু ভিন্ন পথ ধরলেন। তাঁর মতে বইয়ের বহিরাবরণ হবে এমন যাতে দোকানের কাউণ্টারে আর-পাঁচটা বই থেকে পৃথক হ'য়ে তা ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়া বইয়ের চরিত্র অনুযায়ী তার আকার, আয়তন ও আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার রদবদলেও তিনি বিশ্বাস করতেন। এই পন্থা অচিরেই সিগনেটের বইয়ে একটা বৈশিষ্ট্য আরোপ ক'রে গ্রন্থপ্রকাশনার জগতে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

নতুন বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করার নানান অভিনব উপায়ও ডি. কে. উদ্ভব করেন। এ কাজে তাঁর বিজ্ঞাপনের অভিজ্ঞতাকে তিনি ষোলো আনা কাজে লাগিয়েছিলেন। এই উপায় যে কতটা কার্যকরী হয়েছিলো তা বোঝা যায় সিগনেট-প্রকাশিত কবিতার বইয়ের কাটতি থেকে। কাব্যগ্রন্থের ব্যাপক প্রচারের মূলে ডি. কে.-র অবদান বাংলার অনেক কবিই কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করবেন ব'লে আমার বিশ্বাস ;

তবে প্রতিটি বইয়ে সিগনেটের নিজস্ব ছাপ বজায় রাখার প্রবণতা মাঝে মাঝে অসুবিধারও সৃষ্টি করেছে। যেমন আমার ইচ্ছা ছিলো আবোল তাবোল ও হযবরল, আগে যেমন ছিলো ঠিক তেমন ভাবেই সিগনেট প্রকাশ করুক। ডি. কে.-র তাতে ঘোর আপত্তি, এবং সে আপত্তির প্রকাশ এমনই জবরদস্ত যে কার সাধ্যি তাকে খণ্ডায়॥ ফলে বই দুটির সিগনেট-সংস্করণের সঙ্গে সুকুমার-পরিকল্পিত সংস্করণের অনেক প্রভেদ।

আরেকটা ব্যাপারে মতের অমিল মাঝে মাঝে বিরোধের সৃষ্টি করতো। সেটা হ'লো বানান সংস্কার। সুকুমার রায় লিখেছেন 'বেড়াল', সংশোধন ক'রে করলেন 'বেরাল'। তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি যে দু-য়ের মধ্যে ব্যঞ্জনার পার্থক্য আছে, এবং হযবরল-র ক্ষেত্রে বেরালের চেয়ে বেড়াল বেশি সংগত।

ডি. কে. যে অতীতে একটি চলচ্চিত্রপত্রিকা সম্পাদনা করতেন সে-খবর আমি জানি অনেক পরে। পত্রিকার নাম ছিলো খেয়ালী। চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমি আগ্রহী জেনে ডি. কে. তাঁর নিজের উৎসাহের কথাটা বলেন। 'খেয়ালী' পত্রিকা বহুকাল গত হ'লেও ডি. কে.-র উৎসাহ তখনও অম্লান। এর পরিচয় বহন করে সিগনেট কর্তৃক প্রকাশিত বাংলায় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সিরিয়াস প্রবন্ধের প্রথম সংকলন। 'পথের পাঁচালী'র চিত্ররূপ দেবার বাসনাটা

যখন তাঁকে জানাই তখন ডি. কে. অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। সত্যি বলতে কি, ডি. কে.-কৃত 'পথের পাঁচালি'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' আমাকে চিত্রনাট্যের কাঠামো নির্ধারণ করতে অনেকটা সাহায্য করেছিলো।

চিত্র পরিচালনার কাজে নামতে হ'লে আমাকে যে বিজ্ঞাপনের ধরাবাঁধা চাকরি ছাড়তে হবে সেটা ডি. কে. নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে হয়তো তাঁর ভরসা ছিলো যে ফিল্মের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সিগনেটের কাজ ক'রে দিতে আমার অসুবিধা হবে না। সে ধারণা যে ভুল নয় সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছিলো। 'পথের পাঁচালি' ছবি মুক্তি পাবার পর কীমারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেশ-কিছুদিন পর্যন্ত আমি সুযোগ পেলেই দুপুরে এলগিন রোডের ডি. কে.-র বাড়িতে গিয়ে একতলার আপিস ঘরে ব'সে সিগনেটের কাজ ক'রে এসেছি।

সিগনেটের দ্রুত ভাগ্য পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করার সুযোগ বা প্রবৃত্তি কখনো হয়নি। ডি. কে.-র সঙ্গে আমার যোগসূত্র এমনিতেই ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে আসছিলো। একদিকে সিনেমার কাজের ক্রমবর্ধমান চাপ, অন্যদিকে পুনঃ-প্রকাশিত 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ। এরই মধ্যে বেশ-কিছুদিন পর্যন্ত বুঝতে পারতাম যে আমার ফিল্ম সম্পর্কে ডি. কে.-র উৎসাহ অব্যাহত আছে। আমার কোনো নতুন ছবি মুক্তি পাবার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কাছ থেকে আসতো একটি অভিনন্দনমূলক চিঠি। সিগনেটের বইয়ের একটি পৃষ্ঠার মতোই সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন সেই চিঠি। হস্তাক্ষর ছাপার হরফের মতোই স্পষ্ট ও সুগঠিত, ভাষা অনুচ্ছ্বাস হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকতায় পূর্ণ। এই চিঠিগুলোর দিকে চাইলে আজও বুঝতে পারি যে চারিদিকের অবিন্যস্ত দায়সারা ঢিলে-ঢালা কাজের ভীড়ের মধ্যে ডি. কে.-র সামান্যতম কাজও এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রমের পরিচয় বহন করতো।

ডি কে. এবং তরুণ কবিরা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দিলীপকুমার গুপ্ত যখন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে খ্যাতিমান প্রকাশক, শুধু খ্যাতিমান নন, রুচিবান এবং সব দিক দিয়ে আধুনিকতম, সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। এই সব সার্থক মানুষদের সঙ্গে সাধারণত অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেছোকরাদের কোনো যোগাযোগ থাকে না, দেখা হ'লেও কথা বলার সময় থাকে না। কিন্তু সেদিন সেই প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাদের সঙ্গে চার ঘণ্টা কেন কাটিয়েছিলেন, সেটা আমার কাছে আজও একটা বিস্ময়। বস্তুত সেই দিনটিতেই আমার জীবনের একটা মোড় ঘুরে যায়। তার আগে আমি কোনো সোফা-সাজানো বাড়িতে যাইনি। তিনি আমাদের দ্বিগুণ বয়সী ছিলেন কিন্তু সম্বোধন করছিলেন 'আপনি' ব'লে এবং বিশ্বের যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন, ঠিক বন্ধুর মতন। এবং যেরকম আতিথেয়তা করেছিলেন, তা এখনকার দিনে আর কোথাও পাওয়া যাবে কি না, সে-সম্পর্কে আমার গভীর সন্দেহ আছে।

দিলীপকুমার গুপ্ত আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দুটি কাজে। তার আগে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতুম। সেই আমাদের প্রথম কাজে নামা। তাঁর প্ররোচনা বা পরিকল্পনায় আমরা প্রকাশ করি কবিতার পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'। যেমন-তেমন ভাবে কিছু রচনা ছাপিয়ে মলাটে মুড়ে বাজারে ছাড়ার নামই যে পত্রিকা সম্পাদনা বা প্রকাশ করা নয়, এ কথা তিনি বুঝিয়েছিলেন আমাদের। প্রতিটি রচনার প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে সম্পাদকের দায়িত্ব আছে, বিশেষত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের। এবং লিট্‌ল ম্যাগাজিন শুধু নতুন ধরণের রচনাই ছাপবে না, তার লে-আউট, গেট-আপ এবং সামগ্রিক চেহারাও নতুন হবে। মনে আছে, কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যার মলাটটি আমরা দু'বার ছাপিয়েছিলাম, তাঁর আপত্তিতে। প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার ছাপার খরচ পড়েছিলো অনেক কম। কী ক'রে কম খরচে বেশি ছাপা যায়, তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় কাজ, আমাদের সম্মুখে রেখে একটা নাটকের দল গড়া! এ রকম একটি পরিকল্পনা তাঁর নিজেরই ছিলো আগে থেকে, আমাদের পেয়ে তিনি মেতে

উঠলেন একেবারে। মোটাসোটা চেহারার দীর্ঘকায় মানুষটি ছিলেন আসলে লাজুক ধরনের, বেশী লোকজনের সামনে তিনি মন খুলতে পারতেন না, কিন্তু এই ঘরোয়া নাট্যদলে তাঁর উৎসাহ ছিলো বিস্ময়কর। তিনি নাট্যকার নন, পরিচালক নন, অভিনেতা নন, অথচ নাটক দলটির তিনিই প্রাণ পুরুষ। আমাদের নাট্যদল 'হরবোলা' বাংলা নাট্য আন্দোলনে হয়তো কোনো ছাপই রেখে যেতে পারেনি, কিন্তু তেমন ভাবে নাটকের মহড়া প্রযোজনার কথা আজ কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। কারণ এ-রকম একটি বিশাল কল্পনাপ্রবণ মানুষ, টাকাপয়সা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-হিসেবী, শিল্প থেকে আনন্দ পাওয়াই যাঁর প্রধান আকর্ষণ, তেমন মানুষ আমি আর একজনও দেখিনি।

নাটক-অভিনয় উপলক্ষে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে চার-পাঁচ বছর নিয়মিত যাতায়াত আমার জীবনের স্বর্ণযুগ। আমাদের মোশানমাস্টার ছিলেন কমলকুমার মজুমদার, সংগীতশিক্ষক ছিলেন কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অর্থাৎ বটুকদা এবং ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য সন্তোষ রায়। নাটকের মহড়ার চেয়েও আমাদের কাছে প্রধান আকর্ষণীয় ছিলো এইসব ব্যক্তিদের আলাপচারি শোনা। কমলকুমারকে মনে হ'তো রামকৃষ্ণ-কেশব সেনের সমসাময়িক, যদিও হাতে প্রুস্ত্-এর মূল ফরাসী উপন্যাস, তাঁর গল্পের ভাঁড়ার অফুরন্ত। বটুকদা রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্যযুগের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং আই. পি. টি.-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, হাসতে-হাসতে নানারকম চুটকিলা ছাড়ার অপূর্ব দক্ষতা ছিলো তাঁর। আবার সন্তোষ রায় শোনাতেন বিখ্যাত সব ওস্তাদ ও বাঈজীদের কাহিনী। আমাদের আড্ডা কবে যে কোন্ দিকে যাবে তার কোনো ঠিক ছিল না। তখনো সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালি তোলেন নি, তাঁকে জানতুম সিগনেট প্রেসের বইগুলির প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে, তাঁকে দু-একবার দেখেছি। হঠাৎ-হঠাৎ এসে পড়তেন সৈয়দ মুজতবা আলী কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নরেশ গুহ অন্য একটি ঘরে কাজ করতেন।

আড্ডাধারী হিসেবে দিলীপকুমার অর্থাৎ ডি. কে.-র ভূমিকাটি ছিলো বিচিত্র। এরকম উৎসাহী শ্রোতা দেখা যায় না। অতবড় চেহারার পুরুষটির মুখখানা শিশুর মতন, এবং ঘন-ঘন ঘাড় নাড়া ছিলো তাঁর মুদ্রাদোষ। কেউ কোনো বুদ্ধিমানের মতন কথা বললে তিনি হাসি মুখে, ঘন-ঘন ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে তারিফ করতেন। যাকে বলে স্মল্ টক্, অর্থাৎ নিছক কথার জন্য কথা বলা তিনি একদম পছন্দ করতেন না। এবং কমলদা কিংবা বটুকদা কোনো হাস্যরোল-তোলা গল্প বলার পর ডি. কে. একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলতেন, এটা শুনেছেন? তারপরই

তিনি ঠিক একটি পরিপূরক গল্প বলতেন। প্রত্যেক গল্পেরই একটি পরিপূরক গল্প তাঁর জানা। এর প্রকৃত রসিকের লক্ষণ এই, তাঁরা ঠিক সময় ঠিক গল্পটি বলতে জানেন!

বাঙালী প্রকাশকরা সম্প্রদায় হিসেবে খুব একটা শিক্ষিত, এমন প্রমাণ নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্য এবং ইওরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর একই রকম প্রবল আগ্রহ ছিলো। আমরা সেই সময়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'-এর শুধু নামই শুনেছি, চোখে দেখার কোনো উপায় ছিলো না, একদিন তিনি আমাদের প্রায় পুরো বইটির কাহিনীগুলি শুনিয়ে আমাদের বিস্মিত করেছিলেন। আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে ফ্রান্ৎস্ কাফ্‌কা-র-'মেটা মরফসিস' গল্পটির প্রসঙ্গ ওঠে, তিনি সমগ্র গল্পটিই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলতে শুরু করলেন। আমরা তখন সদ্য কলেজের ছাত্র, তখনও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কাফ্‌কা কিংবা রিল্‌কে পড়া ফ্যাশান হিশেবে চালু হয়নি, ডি. কে.-র কাছেই আমি অন্তত কাফ্‌কার নাম প্রথম শুনি। তারপর তিনি আমাকে কাফ্‌কার একটি বই পড়ার জন্য ধার দিয়েছিলেন। তখন আমি জানতুম না যে ছাত্র বয়েসে ডি. কে.-র গৃহশিক্ষক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার জগতে ডি. কে. যে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন, সে-কথা সুবিদিত। এ-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে পারবেন বিশেষজ্ঞরা। নানান কথার ফাঁকে-ফাঁকে আমরাও তাঁর কাছ থেকে কিছু-কিছু শিখেছিলুম, একটা কথা এখনো মনে আছে: লেক্‌স্ এ্যাণ্ড রীভারস্। যে-কোনো একটি ছাপা বইয়ের পৃষ্ঠা দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, দেখেছো, ভেতরে-ভেতরে কত লেক্‌স অ্যাণ্ড রীভারস রয়ে গেছে। অর্থাৎ হ্রদ ও নদী। ছাপা শব্দের মাঝখানে ফাঁক সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। লাইন আটকাবার জন্য যেখানে সেখানে যেমন খুশি স্পেস্-ব্যবহার হয়, তার ফলে যে-সব বিসদৃশ ফাঁক থেকে যায়, তা দেখে সত্যিই যেন মনে হয় ছাপা পৃষ্ঠার মাঝে-মাঝে হ্রদ জমেছে কিংবা নদী ব'য়ে চলেছে। তারপর থেকে প্রুফের পাতায় এই লেক্‌স অ্যাণ্ড রীভারস্ খোঁজা আমার বাতিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। যে-সব ছোটো-খাটো প্রেস থেকে আমরা কবিতার 'কৃত্তিবাস' ছেপেছি, সেখানে এই লেক্‌স অ্যাণ্ড রীভারস্-এর কথা শুনে মালিকরা একেবারে হাঁ।

বাংলা কবিতার জগৎ ডি কে-র কাছে চিরঋণী। রবীন্দ্রনাথ নিজের বই ছাপার জন্য শেষ পর্যন্ত বিশ্বভারতী খুলেছিলেন। রবীন্দ্রপরবর্তী কবিরা

প্রকাশকদের কাছে ছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয়। আধুনিক কবিতা পাঠকদের কাছে ছিলো অবজ্ঞার বস্তু। ডি. কে একই সঙ্গে পাঠকদের সচেতন করলেন, এবং কবিদের দিলেন যোগ্য সম্মান। শুনেছি ডি. কে, যখন জীবনানন্দ দাশের কাছে 'বনলতা সেন' ছাপবার প্রস্তাব দেন, তিনি খুবই অবাক হয়েছিলেন। একটা পুরোনো বই ছাপাবার জন্য অতবড় একটি প্রকাশনালয়ের আগ্রহ? আমাদের নাটুকে দল 'হরবোলা' চলার সমসাময়িক কালেই 'বনলতা সেন' ছাপা হয়। জীবনানন্দ দাশকে কয়েকবার আসতে দেখেছি, একটিও কথা হয়নি, আমরা তো তখন শৌখিন অভিনেতা মাত্র! ঠিক একই সময়ে, যখন ডি. কে. জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ ছাপছেন, তিনি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও নরেশ গুহ নামে দু-জন তরুণ কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক একই রকম গুরুত্ব দিয়ে! হায়, এ-রকম প্রকাশক আজ আর কোথায়! অবশ্য এমন হুতাশ করার কোনো মানে নেই, দিলীপকুমার গুপ্ত সব দিক থেকেই ছিলেন এক মূর্তিমান ব্যতিক্রম। এমনই তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি যে তিনি যাযাবর রচিত 'দৃষ্টিপাত' অমনোনীত ক'রেছেন, কারণ ওতে লেখক মৃত, এই মিথ্যে পরিচয় দেওয়া হয়েছিলো (সে-বই বিক্রি হয়েছিলো তিরিশ না পঞ্চাশ সংস্করণ!), আবার কবিতার বই ছাপছেন মহোৎসাহে।

একটি কবিতাসংকলন এবং একটি কবিসম্মেলনের জন্যও তিনি স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। অনেক কাব্যসংকলনই তো বেরোয়, কিন্তু ডি, কে, প্রকাশ করেছিলেন মাত্র একটি, আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত 'পঁচিশ-বছরের প্রেমের কবিতা'। যখন বইটি বেরোয়, তখন পাঠকমহলে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিলো, পরে আর কোনো কাব্যগ্রন্থের ব্যাপারে সে-রকম কাণ্ড আজ অবধি দেখা যায়নি। প্রতিটি বইয়ের সঙ্গে ক্রেতাকে দেওয়া হয়েছিলো একটি সুগন্ধী লাল গোলাপ। মনে আছে বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের সিগনেট প্রেস দোকান থেকে ঐ রকম একটি গোলাপ পেয়ে শিবরাম চক্রবর্তী বলেছিলেন কী মুস্কিল বলো তো, এমন গোলাপটি উপহার দেবার জন্য আমি তেমন সুন্দরী মেয়ে খুঁজে পাই কোথায়?

বাংলা দেশে এ-পর্যন্ত যত কবিসম্মেলন হয়েছে, তার মধ্যে ডি, কে-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কবিসম্মেলনটিই এখনো যে বৃহত্তম তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ডি. কে-র সমস্ত পরিকল্পনাই ছিলো বিরাট। আমাদের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালার জন্য ডি. কে. ভেবেছিলেন যে রাবণের কুড়িটি হাত এবং দশটি মাথা

হবে ফোল্ডিং কিংবা কোলাপ্‌সিবল্, তিনি অর্ডার দিয়ে বানাবেন। রাবণ-বেশী তাঁর শ্যালক, আমাদের বন্ধু বুড্‌ঢা তাতে রাজি হয়নি ব'লে সেটা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। সেই রকম, কবিসম্মেলনের জন্যও তিনি নির্বাচন করেছিলেন কলকাতার বৃহত্তম হল্‌টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল, যাতে অন্তত পাঁচ হাজার লোক ধরে। কবিসম্মেলনে অত লোক আসার চিন্তাই উদ্ভট, অথচ শেষ পর্যন্ত হল্ উপছে বাইরের ট্রামরাস্তা পর্যন্ত ভিড় জ'মে গিয়েছিলো। দু-দিন ধ'রে হয় সেই কবিসম্মেলন, এবং সবচেয়ে মজার কথা, মূল অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে হ'য়ে গিয়েছিলো একটি রিহার্সাল্। কবিতা-পাঠও একটা আলাদা শিল্প এবং লোক ডেকে এনে যেমন-তেমন ভাবে কবিতা শুনিয়ে দেওয়া অন্যায়, এই ছিলো ডি. কে-র অভিমত। এসব কথা কেউ আগে শোনেনি। মনে আছে, সেই কবিসম্মেলনে জীবনানন্দ দাশ পড়েছিলেন পর পর আটটি কবিতা, কারুকে অনুরোধ করার সুযোগ পর্যন্ত দেননি, সম্ভবত কান বন্ধ ক'রে তিনি ঝড়ের বেগে কবিতাগুলি প'ড়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর শ্রোতাদের শত অনুরোধেও আর কর্ণপাত না ক'রে হঠাৎ প্রস্থান। সেই কবিসম্মেলনে কনিষ্ঠতম কবি হিসেবে আমিও স্থান পেয়েছিলাম ব'লে আজও আমার গর্ব বোধ হয়।

ডি. কে-র সেই উদ্যোগের পর থেকেই এ-দেশের নানা প্রান্তে কবি-সম্মেলনের ধুম প'ড়ে যায়!

ডি. কে. এবং কমলকুমারের মিলিত অধ্যায়টি আমার জীবনে দারুণ প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে। অনেক ঘটনাই মনে পড়ে, সব লেখার সুযোগ এখানে নেই। ডি. কে. প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার উল্লেখ শুধু এখানে করতে চাই।

আমার বিবাহের সময় আমি ডি. কে-কে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তিনি আসেননি। সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যেতেন কদাচিৎ। বাড়ি এবং অফিস ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় তাঁকে প্রায় দেখাই যেতো না। মাঝে-মাঝে বাচ্চাদের নিয়ে গাড়িতে বেড়াতে বেরুতেন। কিংবা অনেক রাত্রে, তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে কলকাতার দূর-দূর প্রান্তে আমাদের পৌঁছে দেওয়া খুব পছন্দ করতেন সে-সময়। সবচেয়ে প্রিয় ছিলো তাঁর বাড়িতে ব'সে কাজ এবং আড্ডা এবং পড়াশুনো। নিমন্ত্রণ-বাড়িতে ভিড়ের মধ্যে তাঁকে সত্যিই যেন মানাতো না।

আমার বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি আসেননি কিন্তু লোক মারফৎ উপহার পাঠিয়েছিলেন। বিয়ের সময় কার কাছ থেকে কী উপহার পাওয়া গেলো

তা কি কেউ পরে মনে রাখে? কিন্তু ডি. কে.-র উপহার আমি আজও মনে রেখেছি। তিনি পাঠিয়েছিলেন একটি প্রায় এক কেজি ওজনের মাছ, সেটি ক্ষীরের তৈরি, একটি কড়ি বসানো লাল লক্ষীর ঝাঁপি, তার মধ্যে একটি রুপোর টাকা এবং একটি সোনালি মলাটের বই, তার নাম 'বাংলার ব্রতকথা'। উপহার পাঠাবার সঙ্গে তাঁর যে অনেকখানি চিন্তা যুক্ত হয়েছিলো, সেটাই সুখস্মৃতি হ'য়ে আছে।

আর একটি ঘটনা। সত্যজিৎ রায় তখন বিশ্বখ্যাত হয়েছেন। তাঁর প্রত্যেকটি ফিল্‌ম্ আমাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। ডি. কে. সত্যজিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর নিন্দে এবং প্রশংসা দুটোই ছিলো অত্যন্ত চড়া রঙের। যা পছন্দ করতেন না, তা একেবারে নাক কুঁচকে উড়িয়ে দিতেন, আর ভালো লাগার জিনিসের প্রশংসা করতেন বুকের দরজা হাট ক'রে। সেই সময় শোনা গিয়েছিলো সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ফিল্‌ম্ করবেন। আরও শোনা গিয়েছিলো, সত্য মিথ্যে যাই হোক, তিনি সুচিত্রা সেনকে নেবেন বিমলার ভূমিকায়। একদিন কথা প্রসঙ্গে ডি. কে. হঠাৎ বলেছিলেন, মানিক যদি সুচিত্রা সেনকে নেয়, তা হ'লে আমি আত্মহত্যা করবো। তুমি ভেবে ছাখো একবার, বিমলার মুখ, তার তাকানো, সেই জায়গায় সুচিত্রা সেন? আমি সত্যিই আত্মহত্যা করবো।

ডি. কে.-র অতখানি তীব্র প্রতিক্রিয়ার মর্ম আমি সেদিন বুঝতে পারিনি। উনি কি মনে মনে উপন্যাসের ঐ নায়িকাটির প্রেমিক ছিলেন? যে ফিল্‌ম্ তখনো তৈরি হয়নি, সেই ফিল্‌মের একটি সম্ভাব্য চরিত্র সম্পর্কে মানুষ অতখানি মর্মাহত হ'তে পারে কী ভাবে? একেবারে আত্মহত্যার কথা? বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন ডি. কে. নিছক কথার কথা নয়, অনেকটা হাহাকারের মতন, আমার আজও কানে বাজে।

অনুষ্টুপ ঃ রক্তে ঘামে বিশটি বছর

অনিল আচার্য

অনুষ্টুপ প্রথম থেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩৭৩ সালের মাঘ মাসে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। সময়ের হিসেবে আমরা এক শতকের এক-পঞ্চম অংশ অতিক্রম করেছি গত বছরেই। কিন্তু দিল্লীর মহাফেজখানার সম্মতি মেলে ১৯৬৬ সাল থেকে। অনুষ্টুপের আদমসুমারী সেই হিসেবেই।

অনুষ্টুপের প্রথম সম্পাদকমণ্ডলী ছিল ছ'জনের, এবং সম্পাদক ছিলেন একজন। সেদিনের দু'জন এখনো অক্লান্ত ও বর্তমান। তাদের একজন সহযোগী সম্পাদক রঞ্জিৎ সাহা এবং অন্যজন বর্তমান প্রতিবেদক। এটুকু নেহাৎ সূচনাপর্বের কথা যখন সম্পাদকের বয়স ষোলো থেকে কুড়ি। ফলত তরুণ কলমচিদের প্রাধান্য এবং বিপুল উৎসাহ। প্রথমদিকে বিশেষ সংখ্যায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের উপস্থিতি নির্দেশ করে পত্রিকাটি তখন বল্গাহীন ও নিরুপদ্রব। তথাপি প্রয়াস লক্ষণীয় এবং এই পর্বে রৌপ্যরেখা বিশেষ গর্কি সংখ্যা। প্রকাশকাল ১৯৬৮।

প্রতিশ্রুতির ক্ষীণরেখাকে নদীবৎ বেগবান করে তুলল তরাই-এর তূর্যনিনাদ। আসমুদ্র হিমাচলে স্পন্দিত হল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। পত্রিকা নতুন মাত্রা পেল ১৯৬৯ সালের পর। সমাজ ও মানুষ রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন প্রশ্ন নিয়ে উঠে এল অনুষ্টুপের পাতায়। অনুষ্টুপ তখনই সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ওতপ্রোত সম্পৃক্ত। সমাজবদলের কাঙ্ক্ষিত আহ্বানে প্রাণিত। উঠতে লাগল তীক্ষ্ণ সব প্রশ্ন। মহর্ষি, দেবর্ষিরা কাষায়যুক্ত মানুষ বলে প্রমাণিত হতে লাগলেন, তথাকথিত রেনেসাঁসের স্বরূপ নিয়েও প্রশ্ন উঠল। প্রাতিষ্ঠানিকতা, কুসংস্কার, মহাপুরুষবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ হ'ল আলোচিত ও বিদ্ধৃত। 'পুস্তক সমালোচকের মস্তকবিক্রয়', 'যাহা সাংবাদিকতা তাহাই সাহিত্য' পাশাপাশি মহাপুরুষদের মূল্যায়ন। সম্পাদকমণ্ডলীতে অঘোষিত

ভাবে হলেও হাল ধরতে এগিয়ে এলেন দীপেন্দু চক্রবর্তী। আরো ছিলেন পুলক চন্দ, কল্যাণ মাইতি প্রমুখ বন্ধুরা। বিভিন্ন আলোচনায় থাকতেন স্বর্ণ মিত্র বা বর্তমান উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। প্রবন্ধে ও গল্পে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের ভাগিনেয়দ্বয় তখন অনুষ্টুপে বিশেষ সক্রিয়। তবে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী দায় বহন করেছেন দীপেন্দু চক্রবর্তী। অনুষ্টুপকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই প্রধান, একথা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

এই সময়ের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা 'শিক্ষাবিষয়ক ক্রোড়পত্র সমন্বিত বিশেষ সংখ্যা।' শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ-সংখ্যায় বেশ কিছু ভালো লেখা প্রকাশিত হয়। 'বৃটিশ-ভারতের শিক্ষা ষড়যন্ত্র', 'কাকে বলব প্রগতিবাদী শিক্ষক', বিভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা। সংখ্যাটিতে শিক্ষাব্যবস্থার বন্ধ্যাদশার কারণ-গুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছিল। অনুষ্টুপের বিশিষ্ট ভূমিকার উল্লেখ করে Frontier পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন হিতেন ঘোষ।

অনুষ্টুপ সম্পাদকমণ্ডলীতে এরপর কিছু অদলবদল ঘটে। পুনর্গঠিত সম্পাদক-মণ্ডলীতে যোগ দেন অন্বেষা মিত্র ও সৃজন সেন। গল্প ও কবিতার পাশাপাশি রাজনৈতিক মতাদর্শকে অবলম্বন করে এ-সময় বহু প্রবন্ধ ছাপা হয়। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস ও ভূমিকা নিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধের পরিকল্পনা হয় এই সময়। সত্তরের প্রথম ভাগে অনুষ্টুপ দুটি খণ্ডে বিশেষ স্তালিন সংখ্যা প্রকাশ করে। প্রথম খণ্ডে ছিল স্তালিনের জীবন, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে প্রায় ১২টি প্রবন্ধ। এই খণ্ডে বিশেষ প্রবন্ধ লেখেন তৎকালীন শ্রীলঙ্কার কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক সম্মুগথাসন। দ্বিতীয় খণ্ডে স্তালিনের সংস্কৃতি চিন্তা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন প্রবীন বড়ুয়া ছদ্মনামে হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এই সংখ্যা দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমাদের দপ্তরে দ্বিতীয় খণ্ডটি নেই।

এর কিছুদিনের মধ্যেই থেমে আসে অনুশাসন পর্ব। অনুষ্টুপের বইপত্র প্রেস এবং গ্রন্থকের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ফলে অনেক পুরানো সংখ্যা আমাদের ফাইলে নেই। বন্ধ হয়ে যায় অনুষ্টুপ। 'অনুশাসনপর্ব' বা জরুরী অবস্থা ঘুচে যাবার পর অনুষ্টুপ আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে।

পত্রিকাটির বর্তমান পর্বের সূচনা জরুরী অবস্থার পর থেকেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা, সে সমস্ত বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে লেখানো এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে সমাজবদলের জন্য কাজ করে যাওয়ার কথা ভেবে নেওয়া হয়। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ও হতাশার মধ্যে নিজেদের পুনর্গঠিত করার

দায়িত্ব নিতে হয়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে যেন শ্মশানের শান্তি বিরাজ করছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতক থেকে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সাহিত্যধারা এবং সাহিত্যিক নিয়ে যেমন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমান পর্যায়ে অনুষ্টুপে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। প্রতিটি প্রবন্ধ তথ্য এবং বিশ্লেষণের সমন্বয়ে নতুন তাৎপর্য আসে এবং নতুন বহু কবি ও লেখক অনুষ্টুপে লেখা শুরু করেন। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন শঙ্কর সেনগুপ্ত, জয়ন্ত চৌধুরী, উদয় ভাদুড়ি, অসিত চক্রবর্তী, মিলন দত্ত প্রমুখ। ১৯৮০ এবং '৮১-তে দুটি বিশেষ সত্তরদশক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দুটি খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় সাতশ এবং প্রায় বাইশটি প্রবন্ধ। সত্তরদশকের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি কিছুই বাদ ছিল না। যদিও দুখণ্ডে এ মূল্যায়ন খণ্ডচিত্রই বহন করে। তবুও কাজটি সমসাময়িক দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অনুষ্টুপ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করলেও সৃজনশীল সাহিত্যে আমাদের ভূমিকাও উল্লেখ্য। মহাশ্বেতা দেবী, স্বর্ণ মিত্র বা উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ছিলেন আমাদের নিয়মিত গল্পকার, এছাড়া শংকর সেনগুপ্ত, অসিত চক্রবর্তী, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, জয়ন্ত জোয়ারদার, মোহিত রায় এবং আরো অনেকেই অনুষ্টুপের নিয়মিত লেখক। এ-পর্যায়ে মহাশ্বেতা দেবী আমাদের সঙ্গে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন।

কবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সব্যসাচী দেব, সমীর রায়, সৃজন সেন, রঞ্জিৎ গুপ্ত প্রভৃতির। এঁরা প্রত্যেকেই অনুষ্টুপে নিয়মিত কবিতা লিখেছেন।

অনুষ্টুপ এভাবেই প্রথমাবধি সামাজিক আন্দোলনের অংশীদার হবার চেষ্টা করে এসেছে এবং সচেতনভাবে সাহিত্যের ও সংস্কৃতির প্রগতিবাদী ও প্রতিবাদী ধারায় নিজেকে যুক্ত রেখেছে। আমরা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অকুণ্ঠ বিশ্বাস রেখে কাজ করেছি এবং এজন্য সচেতনে আমাদের কোন কমপ্রোমাইস বা চরিত্রবিরোধী কাজ করতে হয়নি।

আমরা তথাকথিত কোন 'লিট্‌ল ম্যাগ' ইত্যাদি কনসেপ্ট-এ বিশ্বাস করি না। সামাজিক উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পত্রিকা আজ বিংশ শতকের শেষে প্রকাশ করা যায়, এ-ভাবনা আমাদের চিন্তাতীত। অথবা বলা যায় কোন সময়েই উদ্দেশ্য বিহীন কিছু হয় না। ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনের জন্য দুষ্প্রাপ্য কাগজ— অপচয় আমাদের অসহ্য মনে হয়।

অনুরূপ বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও এই প্রতিবাদীধারার অংশ হিসাবে কাজ করতে চায়। যদি বিচ্যুতি ঘটে, তার জন্য আত্মসমালোচনা করতে আমরা পরাঙ্মুখ নই।

আমরা আশা করব গণতান্ত্রিক এবং প্রতিবাদী ধারার স্রোত আরো তীব্র হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের দাসত্ব ছেড়ে সচেতন লেখক-পাঠক বেরিয়ে আসবেন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাফল্য এবং শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজই আমাদের সেই অভীষ্টে পৌঁছে দিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম লিঃ

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

ক্ষুদ্রশিল্পে রেজিষ্ট্রিকৃত উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহ অতি সহজেই পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের মাধ্যমে নিজ কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। বিশেষতঃ কাঠ ও লৌহজাত আসবাবপত্র, ইনভারটার, ক্যান, প্লাষ্টিক ও এলুমিনিয়ম ইউটেনসিলস্, টিউবওয়েল, হ্যাণ্ডপাম্প, ম্যানহোলকভার, ফিসিংহুকস, জি, আই, বাকেট প্রভৃতির প্রস্তুতকারী ইউনিট সমূহকে অবিলম্বে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

মার্কেটিং ম্যানেজার
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম
শিল্পভবন, ২ ও ৩ নং ব্ল্যাকবার্ণ লেন
(তৃতীয়তল) টেরিটিবাজার, কলিকাতা-১২

BIVAV

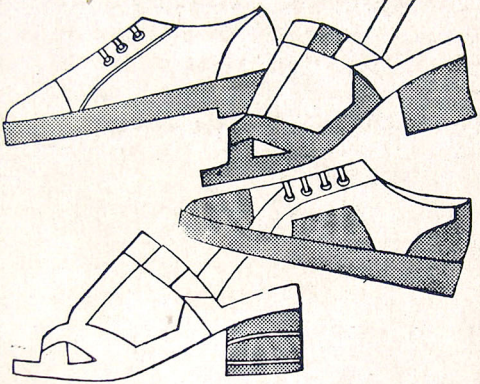

D. K. Gupta Award Issue | October 1985 | Regd. No. RN 30017/76.